

যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক সময় যজ্ঞেশ্বরের অবস্থা ভালোই ছিল। এখন প্রাচীন ভাঙা কোঠাবাড়িটাকে সাপব্যাপ্তবাদুড়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া খোড়ো ঘরে ভগবদগীতা লইয়া কালযাপন করিতেছেন।

এগারো বৎসর পূর্বে তাঁহার মেয়েটি যখন জন্মিয়াছিল তখন বংশের সৌভাগ্যশরী কৃষ্ণপঙ্কের শেষকলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। সেইজন্য সাধ করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন কমলা। ভাবিয়াছিলেন, যদি এই কৌশলে ফাঁকি দিয়া চঞ্চলা লক্ষ্মীকে কন্যারূপে ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারেন। লক্ষ্মী সে ফন্দিতে ধরা দিলেন না, কিন্তু মেয়েটির মুখে নিজের শ্রী রাখিয়া গেলেন। বড়ো সুন্দরী মেয়ে।

মেয়েটির বিবাহ সম্বন্ধে যজ্ঞেশ্বরের যে খুব উচ্চ আশা ছিল তাহা নহে। কাছাকাছি যে-কোনো একটি সৎপায়েন বিবাহ দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যাঠাইমা তাঁহার বড়ো আদরের কমলাকে বড়ো ঘর না হইলে দিবেন না, পণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার নিজের হাতে অল্প কিছু সংগতি ছিল, ভালো পায়ন পাইলে তাহা বাহির করিয়া দিবেন, স্থির করিয়াছেন।

অবশেষে জ্যাঠাইমার উত্তেজনায় শাস্বনাধয়নগুঞ্জিত শান্ত পল্লীগৃহ ছাড়িয়া যজ্ঞেশ্বর পায়ন-সন্ধানে বাহির হইলেন। রাজশাহিতে তাঁহার এক আত্মীয় উকিলের বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

এই উকিলের মঞ্চল ছিলেন জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরী। তাঁহার একমায়ন পুয়ন বিভূতিভূষণ এই উকিলের অভিভাবকতায় কলেজে পড়াশুনা করিত। ছেলোট কখন যে মেয়েটিকে আসিয়া দেখিয়াছিল তাহা ভগবান প্রজাপতিই জানিতেন।

কিন্তু প্রজাপতির চয়নান্ত যজ্ঞেশ্বরের বুঝিবার সাধ্য ছিল না। তাই বিভূতি সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনোপ্রকার দুরাশা স্থান পায় নাই। নিরীহ যজ্ঞেশ্বরের অল্প আশা, অল্প সাহস; বিভূতির মতো ছেলে যে তাঁহার জামাই হইতে পারে এ তাঁহার সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না।

উকিলের যত্নে একটি চলনসই পায়নের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি না থাক, বিষয়-আশয় আছে। পাস একটিও দেয় নাই বটে কিন্তু কালেক্টরিতে ৩,২৭৫ টাকা খাজনা দিয়া থাকে।

পায়নের দল একদিন আসিয়া মেয়েটিকে পছন্দ করিয়া ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের মিষ্টান্ন ও নাটোরের কাঁচাগোলা খাইয়া গেল। বিভূতি তাহার অনতিকাল পরে আসিয়া খবর শুনিলেন। যজ্ঞেশ্বর মনের আনন্দে তাঁহাকেও কাঁচাগোলা খাওয়াইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ক্ষুধার অত্যন্ত অভাব জানাইয়া বিভূতি কিছু খাইল না। কাহারো সহিত ভালো করিয়া কথাই কহিল না, বাড়ি চলিয়া গেল।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় উকিলবাবু বিভূতির কাছ হইতে এক পয়ন পাইলেন। মর্মটা এই, যজ্ঞেশ্বরের কন্যাকে তাহার বড়ো পছন্দ এবং তাহাকে সে বিবাহ করিতে উৎসুক।

উকিল ভাবিলেন, ‘এ তো বিষম মুশকিলে পড়িলাম। গৌরসুন্দরবাবু ভাবিবেন, আমিই আমার আত্মীয়কন্যার সহিত তাঁহার ছেলের বিবাহের চয়নান্ত করিতেছি।’

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তিনি যজ্ঞেশ্বরকে দেশে পাঠাইলেন, এবং পূর্বোক্ত পায়নটির সহিত বিবাহের দিন যথাসম্ভব নিকটবর্তী করিয়া দিলেন। বিভূতিকে ডাকিয়া অভিভাবকমহাশয় পড়াশুনা ছাড়া আর-কোনো দিকে মন দিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। শুনিয়া রাগে বিভূতির জেদ চার গুণ বাড়িয়া গেল।

বিবাহের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে এমন সময় একদিন যজ্ঞেশ্বরের খোড়ো ঘরে বিভূতিভূষণ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞেশ্বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “এসো বাবা, এসো।” কিন্তু, কোথায় বসাইবেন, কী খাওয়াইবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এখানে নাটোরের কাঁচাগোলা কোথায়!

বিভূতিভূষণ যখন স্নানের পূর্বে রোয়াকে বসিয়া তেল মাখিতেছেন তখন জ্যাঠাইমা তাঁহার রজতগিরিনিভ গৌর পুষ্ট দেহটি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। যজ্ঞেশ্বরকে ডাকিয়া কহিলেন, “এই ছেলোটির সঙ্গে আমাদের কমলের বিবাহ হয় না কি।” ভীকু যজ্ঞেশ্বর বিস্ময়িত নেয়েন কহিলেন, সে কি হয়!”

জ্যাঠাইমা কহিলেন, “কেন হইবে না। চেষ্টা করিলেই হয়।” এই বলিয়া তিনি বাথানপাড়ার গোয়ালাদের ঘর হইতে ভালো ছানা ও ক্ষীর আনাইয়া বিবিধ আকার ও আয়তনের মোদক-নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাহারের পর বিভূতিভূষণ সলজ্জ সসংকোচে নিজের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

যজ্ঞেশ্বর আনন্দে ব্যাকুল হইয়া জ্যাঠাইমাকে সুসংবাদ দিলেন।

জ্যাঠাইমা শান্ত মুখে কহিলেন, “তা বেশ হয়েছে বাপু, কিন্তু তুমি একটু ঠাণ্ডা হও।” তাঁহার পক্ষে এটা কিছুই আশাতীত হয় নাই। যদি কমলার জন্য এক দিক হইতে কাবুলের আমীর ও অন্য দিক হইতে চীনের সম্রাট তাঁহার দ্বারস্থ হইত তিনি আশ্চর্য হইতেন না।

ক্ষীণাশ্বাস যজ্ঞেশ্বর বিভূতিভূষণের হাত ধরিয়ে বলিতে লাগিলেন, দেখো বাবা, আমার সকল দিক যেন নষ্ট না হয়।”

বিবাহের প্রস্তাব পাকা করিয়া বিভূতিভূষণ তাঁহার বাপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৌরসুন্দর নিজে নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত ছেলোটিকে মনে মনে বিশেষ খাতির করিতেন।

তাঁহার কোনো আচরণে বা মতে পাছে তাঁহার ছেলের কাছে সুশিক্ষা বা শিষ্টতার অভাব ধরা পড়ে এই সংকোচ তিনি দূর করিতে পারিতেন না। তাঁহার একমাষন প্রাণাধিক পুষন যেন বাপকে মনে মনে ধিক্কার না দেয়, যেন অশিক্ষিত বাপের জন্য তাহাকে লজ্জিত না হইতে হয়, এ চেষ্টা তাঁহার সর্বদা ছিল। কিন্তু তবু যখন শুনিলেন, বিভূতি দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত, তখন প্রথমটা রাগ প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। বিভূতি নতশিরে চুপ করিয়া রহিল। তখন গৌরসুন্দর কিঞ্চিৎ শাস্ত হইয়া নিজেই সংশোধন করিয়া লইয়া কহিলেন, “আমি কি পণের লোভে তোমাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি। তা মনে করিয়ো না। নিজের ছেলেকে লইয়া বেহাইয়ের সঙ্গে দরদস্তুর করিতে বসিব, আমি তেমন ছোটো লোক নই।

কিন্তু বড়ো ঘরের মেয়ে চাই।”

বিভূতিভূষণ বুঝাইয়া দিলেন, যজ্ঞেশ্বর সম্ভ্রান্তবংশীয়, সম্প্রতি গরিব হইয়াছেন।

গৌরসুন্দর দায়ে পড়িয়া মত দিলেন কিন্তু মনে মনে যজ্ঞেশ্বরের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন।

তখন দুই পক্ষে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। আর সব ঠিক হইল কিন্তু বিবাহ হইবে কোথায় তাহা লইয়া কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না। গৌরসুন্দর এক ছেলের বিবাহে খুব ধুমধাম করিতে চান, কিন্তু বুড়শিবতলার খোড়ো ঘরে সমস্ত ধুমধাম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তিনি জেদ করিলেন, তাঁহারই বাড়িতে বিবাহসভা হইবে।

শুনিয়া মাতৃহীনা কন্যার দিদিমা কান্না জুড়িয়া দিলেন। তাঁহাদেরও তো এক সময় সুদিন ছিল, আজ লক্ষ্মী বিমুখ হইয়াছেন বলিয়া কি সমস্ত সাধ জলাঞ্জলি দিতে হইবে, পিতৃপুরুষের মান বজায় থাকিবে কি? সে হইবে না; আমাদের ঘর খোড়ো হউক আর যাই হউক, এইখানেই বিবাহ দিতে হইবে।

নিরীহ-প্রকৃতি যজ্ঞেশ্বর অত্যন্ত দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বিভূতিভূষণের চেষ্টায় কন্যাগৃহেই বিবাহ স্থির হইল।

ইহাতে গৌরসুন্দর এবং তাঁহার দলবল কন্যাকর্তার উপর আরো চটিয়া গেলেন। সকলেই স্থির করিলেন, স্পর্ধিত দরিদ্রকে অপদম্ব করিতে হইবে। বরযাযন যাহা জোটানো হইল তাহা পল্টনবিশেষ।

এ সম্বন্ধে গৌরসুন্দর ছেলের কোনো পরামর্শ লইলেন না।

বৈশাখ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইল। যজ্ঞেশ্বর তাহার স্বপ্নাবিশিষ্ট যথাসর্বস্ব পণ করিয়া আয়োজন করিয়াছে। নূতন আটচালা বাঁধিয়াছে, পাবনা হইতে যি ময়দা চিনি দধি প্রভৃতি আনাহইয়াছে।

জ্যাঠাইমা তাঁহার যে গোপন পুঁজির বলে স্বপ্নগৃহেই বিবাহপ্রস্তাবে জেদ করিয়াছিলেন তাহার প্রায় শেষ পয়সাটি পর্যন্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন।

এমন সময় দুর্ভাগার অদৃষ্টঘনমে বিবাহের দুই দিন আগে হইতে প্রচণ্ড দুর্যোগ আরম্ভ হইল। ঝড় যদি-বা থামে তো বৃষ্টি থামে না, কিছুক্ষণের জন্য যদি-বা নরম পড়িয়া আসে আবার দিগুণ বেগে আরম্ভ হয়। এমন বর্ষণ বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে কেহ দেখে নাই।

গৌরসুন্দর পূর্ব হইতেই গুটিকতক হাতি ও পালকি স্টেশনে হাজির রাখিয়াছিলেন। আশপাশের গ্রাম হইতে যজ্ঞেশ্বর ছইওয়ালা গোরুর গাড়ির জোগাড় করিতে লাগিলেন। দুর্দিনে গাড়োয়ানরা নড়িতে চায় না, হাতে পায়ে ধরিয়ে দিগুণ মূল্য কবুল করিয়া যজ্ঞেশ্বর তাহাদের রাজি করিলেন। বরযাযনের মধ্যে যাহাদিগকে গোরুর গাড়িতে চড়িতে হইল তাহারা চটিয়া আশ্রয় হইল। গ্রামের পথে জল দাঁড়াইয়া গেছে। হাতের পা বসিয়া যায়, গাড়ির চাকা ঠেলিয়া তোলা দায় হইল।

তখনো বৃষ্টির বিরাম নাই। বরযাযনগণ ভিজিয়া কাদা মাখিয়া বিধিবিড়ম্বনার প্রতিশোধ কন্যাকর্তার উপর তুলিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল। হতভাগ্য যজ্ঞেশ্বরকে এই অসাময়িক বৃষ্টির জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।

বর সদলবলে কন্যাকর্তার কুটীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্বামীর বুক দমিয়া গেল। ব্যাকুল যজ্ঞেশ্বর কাহাকে কোথায় বসাইবেন ভাবিয়া পান না, কপালে করায়ত করিয়া কেবলই বলিতে থাকেন, “বড়ো কষ্ট দিলাম, বড়ো কষ্ট দিলাম।” যে আটচালা বানাইয়াছিলেন, তাহার চারি দিক হইতে জল পড়িতেছে। বৈশাখ মাসে যে এমন শ্রাবণধারা বহিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও আশঙ্কা করেন নাই। গণ্ডগ্রামের ভদ্র অভদ্র সমস্ত লোকই যজ্ঞেশ্বরকে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়াছিল; সংকীর্ণ স্থানকে তাহারা আরো সংকীর্ণ করিয়া তুলিল এবং বৃষ্টির কল্লোলের উপর তাহাদের কলরব যোগ হইয়া একটি সমুদ্রমন্থনের মতো গোলমালের উৎপত্তি হইল। পল্লীবৃদ্ধগণ ধনী অতিথিদের সম্মাননার উপযুক্ত উপায় না দেখিয়া যাহাকে তাহাকে যনমাগতই জোড়হস্তে বিনয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বরকে যখন অন্তঃপুরে লইয়া গেল তখন যনুদ্ব বরযাযনীর দল রব তুলিল, তাহাদের ক্ষুধা পাইয়াছে, আহার চাই। মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া যজ্ঞেশ্বর গলায় কাপড় দিয়া সকলকে বলিলেন, “আমার সাধ্যমত যাহা-কিছু আয়োজন করিয়াছিলাম সব জলে ভাসিয়া গেছে।”

দ্রব্যসামগ্রী কতক পাবনা হইতে পথের মধ্যে কতক বা ভগ্নপ্রায় পাকশালায় গলিয়া গুলিয়া উনান নিবিয়া একাকার হইয়া গেছে। সহসা উপযুক্ত পরিমাণ আহাৰ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে বুড়াশিবতলা এমন গ্রামই নহে।

গৌরসুন্দর যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতিতে খুশি হইলেন। কহিলেন, “এতগুলো মানুষকে তো অনাহারে রাখা যায় না, কিছু তো উপায় করিতে হইবে।”

বরযাযনগণ খেপিয়া উঠিয়া মহা হাঙ্গামা করিতে লাগিল। কহিল, “আমরা স্টেশনে গিয়া ট্রেন ধরিয়া এখনই বাড়ি ফিরিয়া যাই।” যজ্ঞেশ্বর হাত জোড় করিয়া কহিলেন, “একেবারে উপবাস নয়। শিবতলার ছানা বিখ্যাত। উপযুক্ত পরিমাণে ছানা কদমা সংগ্রহ আছে। আমার অন্তরের মধ্যে যাহা হইতেছে তাহা অন্তর্যামীই জানেন।”

যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতি দেখিয়া বাথানপাড়ার গোয়ালারা বলিয়াছিল, “ভয় কী ঠাকুর, ছানা যিনি যত খাইতে পারেন আমরা জেগাইয়া দিব।” বিদেশের বরযাযনীগণ না খাইয়া ফিরিলে শিবতলা গ্রামের অপমান; সেই অপমান ঠেকাইবার জন্য গোয়ালারা প্রচুর ছানার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

বরযাযনগণ পরামর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “যত আবশ্যিক ছানা জেগাইতে পারিবে তো?”

যজ্ঞেশ্বর কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া কহিল, “তা পারিব।” “আচ্ছা তবে আনো” বলিয়া বরযাযনগণ বসিয়া গেল। গৌরসুন্দর বসিলেন না, তিনি নীরবে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন।

আহারস্থানের চারিদিকেই পুস্করিণী ভরিয়া উঠিয়া জলে কাদায় একাকার হইয়া গেছে। যজ্ঞেশ্বর যেমন যেমন পাতে ছানা দিয়া যাইতে লাগিলেন তৎক্ষণাৎ বরযাযনগণ তাহা কাঁধ ডিঙাইয়া পশ্চাতে কাদার মধ্যে টপ্ টপ্ করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

উপায়বিহীন যজ্ঞেশ্বরের চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। বারম্বার সকলের কাছে জোড়হাত করিতে লাগিলেন; কহিলেন, “আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আপনাদের নির্যাতনের যোগ্য নই।”

একজন শুষ্কহায্য হাসিয়া উত্তর করিল, “মেয়ের বাপ তো বটেন, সে অপরাধ যায় কোথায়।”

যজ্ঞেশ্বরের স্বপ্নামের বৃদ্ধগণ বারবার ধিক্কার করিয়া বলিতে লাগিল, “তোমার যেমন অবস্থা সেইমত ঘরে কন্যাদান করিলেই এ দুর্গতি ঘটিত না।”

এ দিকে অন্তঃপুরে মেয়ের দিদিমা অকল্যাণশঙ্কাসত্ত্বেও অশ্ৰু সংবরণ করিতে পারিলেন না। দেখিয়া মেয়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরের জ্যাঠাইমা আসিয়া বিভূতিকে কহিলেন, “ভাই, অপরাধ যা হইবার তা তো হইয়া গেছে, এখন মাপ করো, আজিকার মতো শুভকর্ম সম্পন্ন হইতে দাও।”

এ দিকে ছানার অন্যায় অপব্যয় দেখিয়া গোয়ালার দল রাগিয়া হাঙ্গামা করিতে উদ্যত। পাছে বরযাযনদের সহিত তাহাদের একটা বিবাদ বাধিয়া যায় এই আশঙ্কায় যজ্ঞেশ্বর তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বহুতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভোজনশালায় অসময়ে বর আসিয়া উপস্থিত।

বরযাযনরা ভাবিল, বর বুঝি রাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল।

বিভূতি রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, “বাবা, আমাদের এ কিরকম ব্যবহার।” বলিয়া একটা ছানার থালা স্বহস্তে লইয়া তিনি পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোয়ালাদিগকে বলিলেন, “তোমরা পশ্চাৎ দাঁড়াও, কাহারো ছানা যদি পাঁকে পড়ে তো সেগুলো আবার পাতে তুলিয়া দিতে হইবে।”

গৌরসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া দুই-একজন উঠিবে কি না ইতস্তত করিতেছিল - বিভূতি কহিলেন, “বাবা, তুমিও বসিয়া যাও, অনেক রাত হইয়াছে।”

গৌরসুন্দর বসিয়া গেলেন। ছানা যথাস্থানে পৌঁছিতে লাগিল।